International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 69-78
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.197

একুশ শতকের সমাজে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

শ্বেতা চ্যাটার্জী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ, উমেশ চন্দ্র কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 29.01.2026; Accepted: 05.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Buddhist Education is one of the oldest and greatest system among all other Indian Education Systems. Buddhist education system laid stress on knowledge, disciplines and development of life. As Buddhists were a religious sect, all educational activities were run inside Sangha, a place where all learners used to live to acquire knowledge. This education system procured theoretical as well as practical knowledge system. Before starting their education all Shramanas (learners) who were termed as Bikshu or Bikshuni, have to attain Pabbajjā, a procedure same as Upanayana in Vedic Education system. The next stage of education was Upasampada in which the shramanas had to perform strictest dutied of life. Buddhist religious script the Tripitaka played an important role in the curriculum of Buddhist education system. There were three 'pitakas' the first of which is the Sutta Pitaka, consisting of Goutam Buddha's discourses and seremons. The second was the Vinaya Pitaka consisting of instructions for Shramanas and Bikshus and the third was the Abhidhamma Pitaka that highlights Buddhist philosophy and psychology. In the lower level of education system three R's were taught viz. Reading, Writing and Arithmetic. But in higher studies Religion, Philosophy, War studies and Vedas were included. Vocational education was also a part of Buddhist education system. Females were also allowed to receive Buddhist education. students came to study at universities of Nalanda, Vikramshila, Ballabhi, Jagaddal, Sompur, Varanasi, Sarnath, Odontapuri, Mithila, Ujjain and Kanchipuram not only from India but from many foreign countries. Buddhist Education System was really a modern education system which speaks about the fulfilment of life and Nirvana was the ultimate aim in this education system.

Keywords: Buddhist Education, Relevance, 21st century, Eightfold Path, Nirvāṇa

ভূমিকা: ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাচীন যুগের বৈদিক এবং বৌদ্ধ শিক্ষার ধারণাগুলো আলোচনা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।কারণ আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে আদিকালের শিক্ষার বুনিয়াদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের বৈদিক শিক্ষা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক ও গুরুমুখী, যার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক মুক্তি। এই যুগে গুরুরাই ছিলেন আদি শিক্ষক। যারা তপোবনের নির্জন ও শান্ত পরিবেশে তাঁদের নিজস্ব গুরুকুল বা আশ্রমে শিষ্যদের *"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"*[1] অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্ম বিদ্যমান এবং উপাসনা করে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শোক-দুঃখ-জরাগ্রস্ত পৃথিবী থেকে মুক্তির পথ খোঁজাই হল জীবনের পরম লক্ষ্য এই শিক্ষা প্রদান করতেন। শিষ্যদের প্রতি গুরুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই ছিল বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।তবে কালক্রমে বর্ণপ্রথার কঠোরতা ও বাহ্যিক আড়ম্বর সমাজকে গ্রাস করলে, তারই প্রতিবাদে গৌতম বুদ্ধের দর্শনে এক উদার ও জাতিভেদহীন নবজাগরণ ঘটে। আর বুদ্ধের জীবনচর্চা ও দর্শনের উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ

শিক্ষাব্যবস্থা। যা প্রায় ১২০০ বছর (মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল) ব্যাপী বিস্তৃত ছিলো। সময়ের সাথে সাথে এই শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তীতে সংঘ ও বিহারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, যেখানে শৃঙ্খলা, ধ্যান ও প্রজ্ঞাই ছিল শিক্ষার মূল ভিত্তি। অপরপক্ষে, আজকের এই একুশ শতকের সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ থাকলেও মানুষের জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও প্রজ্ঞার অভাব প্রকট। তাই পার্থিব সম্পদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া মানবিক মূল্যবোধ ও মানসিক স্থিরতাকে পুনরুদ্ধারের জন্য বৌদ্ধ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। সেই কারণেই বর্তমান গবেষনাপত্রে সেই চিরন্তন আদর্শের আলোকেই "একুশ শতকের সমাজে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা"-লেখার চেষ্টা করা হল।

উদ্দেশ্য: বর্তমান গবেষণা পত্রটির উদ্দেশ্য হলো একুশ শতকের সমাজে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে পাঠক সমাজকে অবগত করা এবং তা বিশ্লেষণ করা।

একবিংশ শতাব্দীর ধারণা: গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ২১০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে একুশ শতক বা একবিংশ শতাব্দী বলা হয়। এটি তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দী। এই শতকটি মূলত 'তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ' হিসেবেও পরিচিত।

গবেষণার পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে তৎকালীন বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থা এবং একুশ শতকের সমাজে বৌদ্ধ শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছ। যা সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক প্রকৃতির। তাই, বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্তমান গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির (historical method) পাশাপাশি বিশ্লেষণাত্মক (analytical approach) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মাধ্যমিক উৎস (Secondary sources) হিসেবে বিভিন্ন বই এবং গবেষণাপত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা: বুদ্ধ শাক্যমুনির দর্শনে অজ্ঞতাই ছিল ব্যক্তির সকল দুঃখের একমাএ উৎস। তাই এর থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তিনি 'অষ্টাঙ্গিকমার্গ' অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন যা অনুশীলন করতে পারলে ব্যক্তির চিত্তের উন্নতি হয় এবং সে পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হয় বা নির্বাণ লাভ করে। তাই এই কথা বলা যায় যে, বুদ্ধ দর্শনের আধারে গড়ে ওঠা এই শিক্ষা ব্যবস্থার চরম লক্ষ্যই ছিল পার্থিব সকল বন্ধনের বা অজ্ঞতার বা দুঃখের অবসান ঘটিয়ে প্রজ্ঞা অর্জন ও পরিনির্বাণ লাভ করা। তাই সূচনাকালে এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মঠ ও সংঘকেন্দ্রিক এবং প্রধানত ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যম। তবে কালক্রমে তা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের এক মহত্তম কেন্দ্রেও পরিণত হয় কারণ বৌদ্ধ শিক্ষা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যই নয়, বরং এটি ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। আসলে বৌদ্ধধর্ম অনুসারে, শিক্ষা মানেই হলো প্রকৃত জ্ঞান। এবং এই জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তির দুঃখ থেকে মুক্তি এবং মোক্ষ লাভ সম্ভব। তাই প্রাচ্য ভারতে এই শিক্ষাব্যবস্থা এক অনন্য উচ্চতা লাভ করেছিল। নিম্নে প্রাচ্য ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

শিক্ষার লক্ষ্য: বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন দুঃখ জীবনের সারসত্য, তবে তার থেকে মুক্তিও সম্ভব। অর্থাৎ, একথা সত্য যে– *"ill and the ending of ill"*[2]; তবে কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত দুঃখমুক্তি বা নির্বাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেই তিনি তাঁর কাজ শেষ করেননি। প্রচার করেছেন সেই দুঃখমুক্তির উপায়। যা চতুর্থ আর্য্যসত্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ('মার্গ'শব্দের অর্থ হলো পথ)নামে পরিচিত। অষ্টাঙ্গিকমার্গের আটটি অঙ্গ হল-সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প,সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যয়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যক সমাধি। বুদ্ধদেব বলেছেন যে, এই আটটি মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমেই ব্যক্তি তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে এবং এর মাধ্যমেই ক্রমশঃ ব্যক্তি নির্বাণ প্রাপ্তির পথে স্বচেষ্ট হবে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রজ্ঞা,শীল,সমাধিরূপেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অষ্টাঙ্গিকমার্গের প্রথম ওসপ্তম মার্গ (অর্থাৎ সম্যকদৃষ্টি এবং সম্যকস্মৃতি) প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের

এবং সর্বশেষ মার্গটি সমাধির অন্তর্গত। এছাড়া বাকি পাঁচটি মার্গ হল 'শীলের' অন্তর্গত। যেগুলিকে একত্রে 'পঞ্চশীল'ও বলা হয়। উপরিউক্ত এই তিনটি ভাগ (অর্থাৎ, প্রজ্ঞা, সমাধিএবং শীল) সম্পর্কে ধম্মপদের বুদ্ধবর্গে বলা হয়েছে যে ---

"সব্বপাপসা অকরণং কুসল উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদপণং এতং বুদ্ধানুসাসনং।"[3]

অর্থাৎ,বুদ্ধদেবের উপদেশ ছিল– সকল পাপ থেকে বিরত থাকা (শীল), কুশল কর্মের পূর্ণতা সাধন (প্রজ্ঞা) এবং নিজের চিত্তের বিশুদ্ধিকরণ। আর তাই শাক্যমুনির মতে, ব্যক্তির লক্ষ্য হবে সমাজসেবা। কারণ সকলের সেবার মধ্যে দিয়েই আসবে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে আত্মমুক্তি। মূলত এটিই ছিল বৌদ্ধদর্শনের সারকথা। আর বুদ্ধদেব প্রদত্ত এই দর্শনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা। তাই বৌদ্ধযুগের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল– জাগতিক সকল অজ্ঞতাকে দূর করে জ্ঞান প্রদীপের আলোতে মানবজীবনকে আলোকিত করে ব্যাক্তিকে তাঁর জীবনের পরম সত্য উপলব্ধিতে এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করা। অর্থাৎ, বৌদ্ধশিক্ষার চরম লক্ষ্য হলো মানব জীবনকে সততা, পবিত্রতা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে,পার্থিব জন্ম-জন্মান্তরের সকল বন্ধন, অবিদ্যা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি লাভের পথ (নির্বাণ) খুঁজতে সহায়তা প্রদান করা। আর এই নির্বাণ লাভের জন্য আবশ্যক হলো অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন করা। সুতরাং এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনই হলো এই শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া,পঞ্চশীল (Panchasil) নীতি (অসত্য, অসৎ আচরন, অন্যায়, চৌর্য্যবৃত্তি, জীবহিংসা পরিহার) এবং সমাজের নানাবিধ মঙ্গলময় নিয়ম-নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোও ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার কার্যাবলী: বুদ্ধের মতে মানুষের অজ্ঞতাই হল তার সমস্ত দুঃখের কারণ। অজ্ঞতা দূর হলে ব্যক্তি নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয় এবং জাগতিক সকল দুঃখ থেকে মুক্তি বা নির্বাণ (নিঃ-না, বান-ইচ্ছা বা কামনা অর্থাৎ কামনা বা বাসনা থেকে মুক্তি) লাভ করে। সুতরাং বলা যায় যে, সমাজ সংস্কার এবং পার্থিব জীবনের যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে প্রতিটি মানুষকে মুক্ত করাই ছিল এই শিক্ষার প্রধান কাজ। সেই উদ্দেশ্যেই প্রথমদিকে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত থাকলেও, পরবর্তীতে বৌদ্ধ মঠ ও সংঘগুলোতে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের সুতা কাটা, বয়ন, অঙ্কন, গুরুসেবা, ভিক্ষা করা ইত্যাদি কাজও করতে হতো।

শিক্ষার সময়কাল: বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপনয়নের ন্যায়ই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাতেও ভিক্ষু জীবনের সূচনা হতো প্রবজ্যা নামক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সাধারণত আট বছর বয়সে এই অনুষ্ঠান হত। প্রবজ্যার পরে শিক্ষার্থীকে বলা হতো 'শ্রমণ'। প্রবজ্যার সময়কাল ছিল বারো বছরব্যাপী।এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন। তাই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাতে যেকোন বর্ণের লোকই প্রবজ্যা গ্রহণ করতে পারতো। তবে ক্রীতদাস, রাজকর্মচারী, চোর,ডাকাত,হত্যাকারী,ঋণী, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠরোগী, চর্ম রোগী, ক্ষয়রোগী, মৃগীরোগী প্রমূখের সংঘে যোগ দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না। প্রবজ্যা লাভের পর থেকেই শ্রমণকে গুরুর অধীনে থাকতে হতো এবং ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক নানা বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস করতে হতো। শ্রমণের পরবর্তী স্তরটিকে বলা হতো উপসম্পদা। যা ছিল চূড়ান্ত দীক্ষাদানের একটি অনুষ্ঠান। কুড়ি বছর বয়সের পূর্বে কাউকে শেষ দীক্ষা দেওয়া হত না। প্রবজ্যা গ্রহণের পর শ্রমণকে উপাধ্যায় বা আচার্যের অধীনে কুড়ি বছর পর্যন্ত থাকতে হতো। উপসম্পদা হতে হলে দশ জনের এক ভিক্ষু সংঘের অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। ভিক্ষুদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেই তবেই তাকে উপসম্পদা দেওয়া হতো। শিক্ষা শেষে পুরুষ শিক্ষার্থীকে ভিক্ষু এবং নারী শিক্ষার্থীদের ভিক্ষুণী বলা হতো। ১০ বছর উপসম্পদা জীবন

অতিবাহিত করে শিক্ষার্থীরা গুরুপদ অর্জন করতে পারত অর্থাৎ উপাধ্যায় হতে পারতো। সুতরাং, শিক্ষাকালের পরিসর ছিল আট বছর থেকে ত্রিশ বছর (মোট ২২ বছর) সময়কাল পর্যন্ত।

পাঠ্যক্রম: বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম পর্যায়ে মূলত ছিল সংঘবাসীদের জন্যই। আসলে সংঘবাসীদের মনের অজ্ঞতা দূর করা এবং সংঘের নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত করে তোলাই ছিল এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পাঠ্যতালিকায় অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। বুদ্ধদেবের মত ও পথ এই বৌদ্ধ পিটকে (পিটক শব্দের অর্থ হলো ঝুড়ি/বাক্স) পাওয়া যায়। এই পিটক তিনটি খন্ডে (সূত্র পিটক, বিনয় পিটক, অভিধর্ম পিটক) বিভক্ত হওয়ায় এর নাম ত্রিপিটক।

- **সূত্র পিটক:** বুদ্ধদেবের বানী ও উপদেশ এই গ্রন্থে আছে।
- **বিনয় পিটক:** এই গ্রন্থে সংঘবাসী ভিক্ষু ও শ্রমণদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- **অভিধর্ম পিটক:** বৌদ্ধ দর্শন এবং তত্ত্ব বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে যে বৈদিক যুগের ন্যায় বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাও ছিলো প্রথম দিকে প্রধানত ধর্মভিত্তিক। প্রথমদিকে পাঠক্রমে লৌকিক বিদ্যা, জাদু, সংস্কৃত, কূটতত্ত্বের কোনো স্থান ছিলো না। তবে পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় উদারতা পরিলক্ষিত হয়। তার ফলস্বরূপ হিন্দু এবং জৈন ধর্মের নানাবিধ ভাবনা চিন্তাও এই পাঠক্রমে স্থান পেয়েছিল। এই যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় দু-ধরনের শিক্ষা (একটি ছিল প্রাথমিক শিক্ষা এবং অন্যটি হলো উচ্চশিক্ষা) প্রচলিত ছিল। প্রাথমিক স্তরে পঠন, লিখন, পাটিগণিত এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে ধর্ম, দর্শন, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং বেদ শিক্ষার্থীদের শেখানো হতো। বেদের মধ্যে আয়ুর্বেদকে তার ঔষধি গুণের কারণে বিশেষ গুরুত্বও দেওয়া হতো। উভয় স্তরের পাঠ্যক্রমেই ত্রিপিটক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হতো। তবে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও (যেমন সুতা কাটা, বয়ন, অঙ্কন, স্থাপত্য শিল্প, চিকিৎসাশাস্ত্র, কাপড়ে ছাপানো, দর্জিবিদ্যা, হিসাবরক্ষণ, শল্যচিকিৎসা এবং মুদ্রাসংক্রান্ত বিদ্যা) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও উচ্চস্তরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজের পছন্দমতো বিষয় নির্বাচনেরও স্বাধীনতা ছিল।

শিক্ষণ পদ্ধতি এবং মাধ্যম: বৌদ্ধযুগে বিহারগুলিতে সাধারণভাবে মৌখিক শিক্ষার উপরে বেশি করে গুরুত্ব প্রদান করা হতো। যামিনীর প্রথম ও শেষ পর্বে শ্রমণরা তাদের গুরুর থেকে এই মৌখিক পদ্ধতিতেই ত্রিপিটকের জ্ঞানার্জন করতেন। শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা বা সর্বসাধারণের উপলব্ধিমূলক পালি। এছাড়াও, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আঞ্চলিক ভাষাতেও ধর্মশিক্ষা দেওয়া হতো। বর্ণমালা ও সংখ্যা শেখানোর ক্ষেত্রে গুরু স্লেট ব্যবহার করে শিশুকে লিখতে শেখাতেন। বৌদ্ধযুগে লিপির প্রচলন ছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধও করা হয়েছিল। কিন্তু,শিক্ষাক্ষেত্রে লিপির ব্যবহার কম ছিল। তবে ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ,ভারতের পূর্বাঞ্চলে কিছু শিক্ষাক্ষেত্রে লিপির প্রচলন ছিল। মুখস্ত ও আবৃত্তি এই দুটিই ছিল শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। তবে, বৌদ্ধমঠে আলোচনা, বিতর্ক, বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, স্ব-অধ্যয়ন, উপদেশমূলক গল্প, উপকথা, ভ্রমণ ইত্যাদি উপায়েও শিক্ষাদান করা হতো। এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণের প্রাধান্য ছিল ব্যাপক। তবে পরবর্তী সময়ে বিহারগুলোতে বৌদ্ধ শ্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেখানে শ্রেণিশিক্ষার ব্যাবস্থাও গড়ে ওঠে। বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছিলো শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের মানদণ্ড। সেই সময়ে বিতর্কে বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হতো এবং বিজয়ীর নাম সিংহদ্বারেও লেখা হতো। প্রতি মাসের প্রথম দিনে এবং প্রতি পূর্ণিমাতিথিতে মঠের সমস্যা সমাধানের জন্য সকল গুরু এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সভার ব্যবস্থা করা হত। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্যও প্রদান করা হতো। সমসাময়িক যুগে কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ

শান্তিদেব, আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি প্রমুখ। যারা দার্শনিক চিন্তাভাবনায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে দর্শন ও সাহিত্যে বিশাল অবদান রেখেছিলেন।

বৌদ্ধশিক্ষায় শৃঙ্খলা: বৌদ্ধশিক্ষায় জীবনযাত্রা ছিল সুনির্ধারিত। সংঘের প্রত্যেক ভিক্ষুকে সংঘের নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। শিক্ষক তথা শিক্ষার্থীদের জীবন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত কর্তব্যের মোড়কে বাঁধা। বরিষ্ঠ ব্যাক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করা এবং সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে শিক্ষকের সেবা করাই ছিল বৌদ্ধ যুগের শিক্ষার প্রধান শৃঙ্খলাগত ধারণা। শিক্ষক যখনই ইচ্ছা করতেন, শিক্ষার্থীরা তখনই শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকত। যেহেতু বৌদ্ধশিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল আধ্যাত্মিক প্রকৃতির, তাই শিক্ষার্থীরা মঠ বা বৌদ্ধ সঙ্ঘের নিয়মকানুনের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিল। শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শিক্ষার্থীদেরকে মূলত দশটি শীল (১. প্রাণ হরণ করবে না, ২. অদত্ত গ্রহন করবে না, ৩. ব্রহ্মচর্য ভাঙবে না, ৪. মিথ্যা কথা বলবে না, ৫. মত্ততা আনতে পারে এমন পানীয় গ্রহন করবে না, ৬. নৃত্য-গীতে অংশ নেবে না, ৭. মালা, চন্দন, সুগন্ধি প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করবে না, ৮. কোমল শয্যায় শয়ন করবে না, ৯. দান হিসেবে সোনা বা রুপো নেবে না, ১০. বিকেলে আহার করবে না) পালন করতে হতো।

তবে কোনো ভিক্ষু কোনরকম অপরাধ করলে (যেমন– শিক্ষার্থীর নম্রতার ও লজ্জা বোধের অভাব ঘটলে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা–ভক্তির অভাব ঘটলে ইত্যাদি) দশজন প্রধান ভিক্ষু মিলে অপরাধীর শাস্তির বিধান করতেন। প্রতিমাসে দুবার ভিক্ষুসভায় তাই শাস্তি সংক্রান্ত প্রতিমোক্ষ গ্রন্থপাঠ হতো। কেউ সংঘের নিয়মকানুন ভঙ্গ করে থাকলে সভায় সে নিজমুখে তা স্বীকার করতো এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হতো। তবে ভিক্ষু জীবনের প্রধান শাস্তি ছিল শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে শিক্ষার্থীকে মঠ থেকে বহিষ্কার করা অর্থাৎ ভিক্ষুত্ব চ্যুতি। অন্যদিকে, শিক্ষকের কোনো অপরাধ শিক্ষার্থীরা পরিলক্ষিত করে থাকলে তা তারা সংঘকে অবগত করার সুযোগ পেত। অর্থাৎ, মঠের শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয় পক্ষকেই সদা সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো।

নারী শিক্ষা: নারী শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক গবেষণায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাথমিক যুগে বুদ্ধ নারীদের সমস্ত অমঙ্গলের উৎস হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাই প্রাথমিক বৌদ্ধ যুগে নারী শিক্ষার চিত্র খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। নারীদের মঠে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে প্রায় ৪০০ জন নারীকে বুদ্ধদেব তাঁর সৎমায়ের সাথে বিহারে ভর্তির অনুমতি প্রদান করেন। সংঘে ভিক্ষুণীদের গ্রহণ করা হলেও তাদেরকে ভিক্ষুদের প্রাধান্য এবং নানা নিয়ম কানুন মেনে চলতে হত।ভিক্ষুণীদের শিক্ষার জন্য একজন ভিক্ষুকে মনোনীত করা হত। তিনি অন্য এক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুণীদের শিক্ষা দিতেন। এবং দীর্ঘ দু-বছর কাল পরীক্ষাধীন থাকার পর ভিক্ষুণীকে দীক্ষা দেওয়া হত।ভিক্ষুণীদের জীবন যাপনের নির্দেশিকাকে বলা হতো ভিক্ষুণী প্রতিমোক্ষ। এদের জন্য নির্মিত হতো স্বতন্ত্র সংঘারাম।শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ভিক্ষুসংঘের সাধারণ অনুশাসন ছাড়াও ভিক্ষুণীদের বারোটি বিশেষ নিয়ম (যেমন: পুরুষদের সঙ্গে একঘরে থাকা নিষিদ্ধ, পুরুষ স্পর্শ করা যাবে না, একা বেড়ানো নিষিদ্ধ, নদী পার হওয়া যাবে না, বিয়েতে ঘটকের কাজ করা যাবে না, গুরুতর পাপ গোপন করা যাবে না, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না ইত্যাদি) কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো । সেই যুগে বহু ধনী কন্যা স্বেচ্ছায় ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করতেন। বৌদ্ধগ্রন্থে বিশাখা, সুভা, অনুপমা, সুমেধা প্রভৃতি ভিক্ষুণীদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব জ্ঞানসম্পন্না বৌদ্ধ মহিলারা সংঘের শিক্ষাদান, আর্তসেবা ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত হতেন। এছাড়া বহু ভিক্ষুণী মীমাংসা, বেদান্ত, আয়ুর্বেদ, সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ নারীদের আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক অনুভূতির প্রমাণ হল

ভিক্ষুণীগণ রচিত 'থেরিগাথা' সংকলন। এই গাথাগুলির মূল বক্তব্য হল বৌদ্ধসংঘের ত্যাগ ও নির্বাণের মহিমা প্রকাশ। যা ছিল একাত্তর জন ভিক্ষুণীর রচনার সংকলন। সুতরাং, একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে বৌদ্ধ নারীরা ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল রাজানুকুল্যে গড়ে ওঠা সংঘ ও বিহারগুলি। যেখানে আবাসিক বিহার গুলিতে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে ভিক্ষুদের আত্মসচেতনতাকে পূর্ণরূপে প্রকাশের শিক্ষা প্রদান করা হত। অর্থাৎ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মশিক্ষা ও সাধনার প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সংঘগুলি, যা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এই যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমিত, যা কেবলমাত্র মঠের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে, পরবর্তীকালে এই শিক্ষাব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এর ফলশ্রুতিতেই সকল সাধারণ মানুষও এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এই যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নতমানের। তাই দেশ-বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসত। নালন্দা, বিক্রমশিলা, বল্লভী, জগদ্দল, সোমপুর, বারাণসী, সারনাথ, ওদন্তপুরী, মিথিলা, উজ্জয়িনী ও কাঞ্চীপুরম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ছিল আন্তর্জাতিক মানের।

পরীক্ষা ব্যবস্থা: বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মৌখিক পদ্ধতিতেই (প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্কের মাধ্যমে) তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়েই শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এবং শিক্ষা শেষে বিদগ্ধ ভিক্ষুমন্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত সফল শিক্ষার্থীদেরকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থবির, পন্ডিত, বহুশ্রুত প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হত।

গুরু–শিষ্যের সম্পর্ক: বৈদিক যুগের মতোই বৌদ্ধযুগেও গুরু-শিষ্যের আন্তসম্পর্ক ছিল অতি মধুর। পিতার সেবা করা যেমন পুত্রের কর্তব্য তেমনি স্বতপ্রণোদিতভাবে গুরু সেবা করাও (যেমন: গুরু অসুস্থ হলে তার সেবা করা, আহারান্তে গুরুর এঁটো পাত্র ও আহারের স্থান পরিষ্কার করা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগের পরে গুরুর মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করা, ভিক্ষা সংগ্রহে গুরুর সাথে একসাথে যাওয়া ইত্যাদি) ছিল শিষ্যের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বৌদ্ধযুগে শিষ্যের দায়িত্ব আগে থেকে নির্ধারন করা থাকত। তাকে সিদ্ধবিহারক বলা হত।গুরুকে সেবা করার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী বিদ্যা অর্জন করত। অপরপক্ষে, শিষ্য অসুস্থ হলেও কর্তব্যপরায়ন গুরুদেব তাকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করতেন। বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাগুরু ছিলেন একনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী ,মহা পন্ডিত এবং সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। অর্থাৎ শিক্ষক হলেন এমন একজন সাধক যিনি শিক্ষার্থীদের আগে পথ চলেছেন। এজন্য তাকে 'আধ্যাত্মিক নির্দেশক' বলা হত। তাদের মহান জীবন আদর্শ শিক্ষার্থীদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করত।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের দুটি বিভাগ ছিল— ১. উপাধ্যায় (যিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করতেন), ২. কর্মাচার্য (যিনি শিক্ষার্থীদের আচার-আচরন যাতে আদর্শধর্মী বা বিনয়ী হয় সেজন্য প্রশিক্ষণ দিতেন)। শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য ছিল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা। এছাড়া গ্রন্থ রচনা, ধর্ম প্রচার, আলোচনা এবং জটিল বিষয়গুলো স্পষ্ট করার জন্য তর্কের আয়োজন করাও ছিল তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধশিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষককেও নিজেকে কমপক্ষে দশ বছর ভিক্ষু হিসেবে অতিবাহিত করতে হতো এবং অবশ্যই উন্নত মানসিক শক্তির, পবিত্র চরিত্র, উদারতার মূর্ত প্রতীক হতে হতো। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই মঠের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেন এবং তাঁদের কর্তব্যও পূর্বেই পৃথকভাবে নির্ধারন করা ছিল। তবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান পদ্ধতি, পোশাক, খাদ্য এবং বাসস্থানের বিষয়ে শিক্ষক সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল ছিলেন।

সুতরাং, বলা যায় যে গুরু–শিষ্যের সম্পর্ক পারস্পরিক সহমর্মিতা, আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

একুশ শতকের সমাজে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা: একবিংশ শতাব্দীর এই দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং যান্ত্রিকযুগে শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা কেবল অনস্বীকার্যই নয়, বরং অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে প্রধানত কর্মসংস্থান এবং প্রতিযোগিতামুখী, সেখানে বৌদ্ধদর্শন মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক গুণাবলির বিকাশে এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক চরিত্রের প্রাধান্য এবং মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা হল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল নীতিকথা। বুদ্ধদেব ছিলেন নীতিশাস্ত্রের শিক্ষক এবং সমাজসংস্কারক। তাঁর মতে- কেবল তর্ক নয়, নীতি- নৈতিকতাই হল জীবনের মূল চালিকাশক্তি। তাই পবিত্র জীবন, বিচার- বিশ্লেষণ, ধ্যান-অনুধ্যান, প্রত্যক্ষ অনুমান, ও অনুশীলনই হবে শিক্ষার পদ্ধতি। তাঁর শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো প্রজ্ঞা, শীল এবং সমাধি। আধুনিক শ্রেণিকক্ষে যখন আমরা শিক্ষার্থীদের কেবল তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করছি, তখন বৌদ্ধশিক্ষা আমাদের শেখায় কীভাবে সেই তথ্যকে প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত করা যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন শৈলীর মধ্যেই এর আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া একবিংশ শতাব্দীর মানসিক চাপের এই সময়ে 'মাইন্ডফুলনেস' বা সচেতনতা এবং ধ্যানের গুরুত্ব বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য বৌদ্ধ এই পদ্ধতিগুলো (বিপাসনা মেডিটেশন, জেন মেডিটেশন ইত্যাদি) আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে।বুদ্ধদেবের মতে–অজ্ঞানতাই হলো মানুষের জীবনের যত দুঃখের কারণ। আর এই দুঃখনাশের জন্য তিনি সমাজসেবাকেই অন্যতম পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। বর্তমানে সমাজসেবাকে শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে নানাবিধ বৃত্তিশিক্ষা যেমন : সূতা কাটা, বয়ন, অঙ্কন, চিকিৎসা, কাপড়ে ছাপা, দর্জিগিরি, হিসাবরক্ষণ, অস্ত্রোপচার এবং মুদ্রাবিদ্যার মতো বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই বিষয়গুলো আজও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমাজে বেকারত্ব সমস্যা হ্রাসের জন্য প্রাসঙ্গিক। NEP 2020 -তেও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বৃত্তিশিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সুতরাং, এই দিক থেকেও একুশ শতকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রেও অতীব প্রাসঙ্গিক। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বা একটিভিটি বেসড লার্নিং-এর উপরেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বৌদ্ধ শিক্ষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভেষজ উদ্ভিদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি পাঠ (nature study) করতে হতো। প্রকৃতি পাঠকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ কৌতূহল জাগিয়ে তোলার সেরা উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যা আধুনিক যুগের শিক্ষার্থীদের জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বৌদ্ধ শিক্ষায় মাতৃভাষা তথা শিখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে গল্প বলা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি পদ্ধতির উপরেরও জোর দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মৌখিক পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়েছিল। যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের জনশিক্ষার ব্যবস্থাও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। সর্বোপরি বৌদ্ধশিক্ষা ছিল আনুষ্ঠানিক ও সংঘজীবনের অনুশীলন। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কোনো মঠ বা বিহারে থাকতেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করত। বৌদ্ধ শিক্ষক ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-তিনি গুরু ও আচার্য। তাঁর জীবনচর্যা বিদ্যার্থীদের জীবনবোধে অনুপ্রাণিত করত। শুধু জ্ঞানচর্চা নয়, জীবনে মূল্যবোধের চর্চা ও জীবনে তা সাঙ্গীকৃত করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। নির্বাণই ছিল পরম লক্ষ্য। বৌদ্ধ মতে অর্থের লালসা ও ক্ষুদ্র ভোগবাদী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে পরার্থপর, করুণা ও প্রেমে সিক্ত জীবনবোধ

গড়ে তোলাই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

মানুষের এই জীবনবোধে উত্তরণই আধুনিক শিক্ষার মূলকথা। অর্থাৎ, বলা যায় যে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামো সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। এছাড়া বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে বাস্তববাদ ও প্রয়োগবাদের মিল দেখা যায়। শিক্ষায় সমসুযোগের সুরটি প্রথম বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাতেই ধ্বনিত হয়েছে। শিক্ষার অধিকারের এই নীতি ভারতে আজও প্রাসঙ্গিক এবং সেই কারণে ২০০৯ সালে ভারত সরকার 'শিক্ষার অধিকার আইন' (RTE Act) পাস করে এবং শিক্ষা এখন ভারতের নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও এই দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। তাই বলা যায়, ভারতীয় শিক্ষায় গণতান্ত্রিক চেতনার প্রবর্তন বৌদ্ধশিক্ষার ফলশ্রুতি। বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম স্তম্ভ হলো অহিংসা এবং করুণা। বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ জাগিয়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বৌদ্ধ দর্শনের 'পঞ্চশীল' বা নৈতিক আচরণবিধি পালনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এটি কেবল পুথিগত বিদ্যা নয়, বরং জীবনযাপনের একটি দর্শন যা একজন শিক্ষার্থীকে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হতে এবং অন্যের অস্তিত্বকে সম্মান করতে শেখায়। ফলস্বরূপ বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (inclusive education) ইত্যাদির ধারণা উদ্ভূত হয়েছে।বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'মধ্যপন্থা'র ওপর, যা শিক্ষার্থীদের চরমপন্থা পরিহার করে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া বুদ্ধের 'কালম সূত্র' [কালম সূত্রের ১০টি মানদণ্ড: বুদ্ধ কোনো সত্যকে গ্রহণ করার আগে ১০টি বিষয় থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন: ১. লোকশ্রুতি বা শোনা কথা (Anussava), ২. বংশপরম্পরা বা ঐতিহ্য (Paramparā), ৩. গুজব বা জনরব (Itikirā), ৪. ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি (Piṭaka-sampadāna), ৫. যুক্তিনির্ভর অনুমান (Takka-hetu), ৬. নীতিশাস্ত্র বা নয় (Naya-hetu), ৭.বাহ্যিক আকার বা বিচার (Ākāra-parivitakka), ৮. নিজের মতামতের সাথে মিল (Diṭṭhi-nijjhāna-kkhanti), ৯. বক্তার আপাত যোগ্যতা (Bhabba-rūpatā), ১০. নিজের গুরুর প্রতি ভক্তি (Samaṇo no garūti)] আমাদের অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করতে শেখায়, যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির প্রয়োজন। বৌদ্ধ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কেবল একজন দক্ষ কর্মী হিসেবে নয়, বরং একজন আদর্শ ও সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের মুক্তি এবং কল্যাণ, তবে বৌদ্ধ দর্শনের সেই প্রাচীন অথচ চিরনতুন শিক্ষাগুলো আজকের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারে। তাই বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতা কাটিয়ে শান্তি ও সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ শিক্ষার প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপসংহার ও বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষাগত গুরুত্বের সারসংক্ষেপ:

ভারতীয় বৌদ্ধদর্শন মূলত নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক দর্শন।এবং গৌতমবুদ্ধ ছিলেন এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা আর বুদ্ধদেব প্রদত্ত এই দর্শনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা। তাই বৌদ্ধযুগের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল–জাগতিক সকল অন্ধকার বা অজ্ঞতাকে দূর করে, জ্ঞান প্রদীপের আলোতে মানবজীবনকে আলোকিত করে ব্যাক্তিকে তাঁর জীবনের পরম সত্য উপলব্ধিতে এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করা। এছাড়া বৌদ্ধদর্শন তথা বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা মহাবিশ্বের পরিবর্তনের অনিবার্য নিয়মকেও গ্রহণ করেছে।তাই বলা যায় এই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রয়োগবাদী (pragmatic), যা সংকীর্ণ জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত

করে সকলকে শিক্ষা প্রদান করত। বিশ্বজনীন প্রকৃতির কারণে বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলো জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সব ধরনের পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত ছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের ওপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হতো, যার জন্য বৌদ্ধ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করত। এই শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি তাৎপর্য ছিল 'ইতিবাচকতা' (Positivism)। বৌদ্ধ শিক্ষার পেছনের দর্শন ছিল ইতিবাচক এবং এটি সুশৃঙ্খল ধারণাগুলোর অত্যন্ত সতর্ক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করত। এটি অনেকাংশে গণতান্ত্রিক ছিল কারণ এটি অনুসন্ধানের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত। বৌদ্ধধর্মের সমস্ত কৌশল উন্নত চরিত্র গঠনের পক্ষে ছিল, যা একটি বলিষ্ঠ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থারও সারমর্ম। এছাড়াও কর্মফলে বিশ্বাস বর্তমান জীবনে নিজের আচরণ ঠিক রাখার ওপর জোর দেয়। হাতের কাজের দক্ষতার (Manual skills) ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সূতা কাটা এবং বয়নের মতো কায়িক শ্রমের দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হতো যাতে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল প্রধানত মৌখিক। উপদেশ, পুনরাবৃত্তি, ব্যাখ্যা, আলোচনা এবং বিতর্ক সবই ব্যবহৃত হতো। বৌদ্ধ পরিষদগুলো আলোচনার জন্য সেমিনারের আয়োজন করত। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবস্থায় বিদগ্ধ সম্মেলন, ধ্যান এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণকে উৎসাহিত করা হতো, যা বর্তমানের আধুনিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকেই প্রতিফলিত করে। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা হিসেবে এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রভাবের কথাও উল্লেখ করা যায়। এটি ভারতকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জনে সহায়তা করেছিল যা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এটি ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচিরও বিকাশ ঘটিয়েছিল। সর্বোপরি, নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসেবে মূল্যবোধের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন সেই সময়ে সব ধরনের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। সকল শিষ্যের মধ্যে নৈতিকতার উন্নতির জন্য বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। সেই অনুযায়ী, এই সম্মানিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর শিক্ষার্থী হিসেবে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল, যা নৈতিক শিক্ষা ও শান্তির নির্দেশনা প্রদান করে। পরিশেষে, বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক কৌশলগুলো সুআচরণ বিকাশের দিকনির্দেশনা দেয় যা শিক্ষার একটি বলিষ্ঠ ব্যবস্থার মূল নির্যাস।

পরিশেষে বলা যায় যে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবনে সুখ আনয়নে সফল ছিল। সেই সময় বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার্থীরা কোনো অন্যায় করতে পারত না, চুরি বা হত্যা করতে পারত না এবং মদ্যপানে আসক্ত হতো না। সমস্ত শিক্ষার্থী লোভ, শত্রুতা, অজ্ঞতা ও কাম থেকে মুক্ত হতে পারত। সেই কারণেই আজও সারা বিশ্বে একবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা, সেমিনার ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, ড. সুভাষচন্দ্র (২০১৮)। শিক্ষাবিজ্ঞান, সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা. লি। কলকাতা, পৃষ্ঠা-২১০।
২. Rhys, Davids (1870). Buddhism, William and Norgate, London, P. 150.
৩. গুপ্ত, মিহির (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার)। সেন, রণব্রত (সম্পাদনা)। (১৯৮৮)। ধম্মপদ, হরফ প্রকাশনী। কলকাতা, পৃ. ১২৩।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র–পত্রিকা:

১. গুপ্ত, মিহির (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার)। সেন, রণব্রত (সম্পাদনা)। (১৯৮৮), ধম্মপদ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

২. চৌধুরী, সুকোমল (২০১৪)। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

৩. Maheshwari, V.K. (2012). Education in Buddhist period in India Research paper.

৪. Chakma, D. (2020). Biddhist Educational System.

৫. Kaur, A. Effectiveness of Instructional Model Based on Mind Brain and Education Science Approach.

৬. Pachaury, G. Philosophy of Education. R. Lall Book Depot, Meerut.

৭. Singh, S. (2017). The Educational Heritage of Ancient India. Notionpress.com

৮. Khakhlary, M. (2019) "The Importance of Buddhist System". https://www.researchgate.net/publication/330799064

৯. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র (২০০৭)। ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা।

১০. বসু, সুজিত (১৯৮৪)। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম। দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা।

১১. ভট্টাচার্য, সুনীল (২০১৫)। বৌদ্ধ জাতক সংগ্রহ, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কোলকাতা।

১২. সেন, ড. দেবব্রত (১৯৮৭)। ভারতীয় দর্শন। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কোলকাতা।

১৩. রায়, ড. সুভাষচন্দ্র (২০১৮)। শিক্ষাবিজ্ঞান। সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা. লি, কলকাতা।

১৪. Ma Rhea, Zane (2012). Buddhist foundations of teaching. Research paper.

১৫. Vijayakumar, S. Multimedia Infrastructure and Practical Application: Is There a Correlation?

১৬. চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদনা) (১৯৯৮)। ভারতীয় ধর্মনীতি। এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

১৭. সান্যাল, জগদীশ্বর (২০১৪)। ভারতীয় দর্শন। শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

১৮. চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ (প্রকাশক) (২০১৫)। প্রসঙ্গ গৌতমবুদ্ধ: নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন। ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।